আলোচনা

2019-20 [January, 20 to June, 20] চতুর্থ সেমেস্টারের

Bengali Hons. ছাত্রছাত্রীদের জন্য :

মূলগ্রন্থ : সঞ্চয়িতা

আলোচ্য বিষয় : এক. মেঘদূত কবিতা : পৃষ্ঠা : এক – পৃষ্ঠা : চোদ্দ

দুই. চঞ্চলা কবিতা : পৃষ্ঠা : পনেরো - পৃষ্ঠা : কুড়ি

Scanned with CamScanner

◻ বলাকা কাব্যগ্রন্থের 'চঞ্চলা' কবিতা : আলোচনা

এলাহাবাদে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ চঞ্চলা কবিতাটি রচনা করেন। ১৩২১, অগ্রহায়ণ সংখ্যার সবুজপত্র পত্রিকায় 'চঞ্চলা' নামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এইসময় 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ৮নং কবিতা হিসেবে এই কবিতাটিকে চিহ্নিত করা হত। আবার কবিতাটির প্রথম পংক্তি অনুসারে অনেক সময় কবিতাটি 'হে বিরাট নদী' হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৮

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।

Scanned with CamScanner

স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া।
সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে;
বারংবার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও;
ফিরে নাহি চাও,
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয়;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি

Scanned with CamScanner

পলকে পলকে—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।
ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা-কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
গান হতে গানে।
ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।

Scanned with CamScanner

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্‌ তীরে,
তাকাস নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।

এলাহাবাদ
রাত্রি
৩ পৌষ ১৩২১

Scanned with CamScan

কবিতাটিতে প্রথমেই দেখা গেল কবি রবীন্দ্রনাথ সমগ্র-সৃষ্টিকে নদী হিসেবে কল্পনা করেছেন। নদীর গতিশীল জলপ্রবাহরূপেই তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে দেখেছেন। কবিতার প্রথম স্তবকেই নদীর অনুষঙ্গ হিসেবে ফেনা, স্রোত, ও বুদবুদের কল্পনা এসেছে। কবির দৃষ্টিতে বস্তু হচ্ছে এই গতিশীল জলপ্রবাহের ফেনা, সূর্য, চন্দ্র তারা বুদবুদ, আর বর্ণ হচ্ছে স্রোত। আলোকের বিচ্ছুরিত তীব্রচ্ছটায় বর্ণস্রোত বয়ে চলেছে। – কবির ভাষায়:
'আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে'। – তেমনই যাচ্ছে বর্ণস্রোতে কোথাও রং-এর বর্ণালিকে ঘুমিয়েছে। আলোর আভরঃ-এর সমাহারে নদীর জলে এই বর্ণালির বিচ্ছুরণ। এই কারণেই প্রথম স্তবকে ফেনা, বুদবুদ বা স্রোতের কল্পিতা এসেছে। – নদী বা জলরাশি যা বহমান যদি গতিশীল সৃষ্টিকে বোঝাতে ব্যবহার বা অবলম্বন করা। তবে 'অন্ধকার হতে বহমান বর্ণস্রোত এখানে বৈচিত্র্যকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে বলা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে নদীকে কবির সম্বোধন: 'হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিনী' – যেহেতু নদী এখানে সৃষ্টির প্রতিরূপ, সেই কারণে ভৈরবী বা বৈরাগিনী সম্বোধন এখানে সৃষ্টির উপর প্রযোজ্য। ভৈরবী শব্দের অর্থ সংসদ বাংলা অভিধানে পাওয়া যাচ্ছে: "১. দশমহাবিদ্যার অন্যতম মূর্তি; ২. শৈবসন্ন্যাসিনী, ৩. সংগীতের প্রাত:কালীন রাগিনীবিশেষ।"[১]

কবি এখানে নদী তথা সৃষ্টিকে বলছেন 'হে ভৈরবী'। – এখানে দশমহাবিদ্যার অন্যতম মূর্তি অর্থাৎ কালী অর্থে ভৈরবী শব্দটি প্রযুক্ত। কীভাবে? সৃষ্টি তথা গতিশীল নদীর যে চলা সে চলা নিরুদ্দেশ, সে চলা 'অন্তহীন দূর'। তাই তার গতি অবিরাম। এই ভৈরবী যেন সর্বনাশা প্রেমে উন্মত্ত অভিসারে চলেছে। তার বুকে যে হার দুলছে সেখানে পুঁতি হিসেবে গাঁথা রয়েছে নক্ষত্রের মণি। সে হারের পুঁতিগুলি বার বার ঝরে ঝরে পড়ছে। কারণ মহাকাশেও তো নক্ষত্রের জন্মমৃত্যু আছে। মৃত্যুর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রগুলি যেন সেই হার থেকে ঝরে পড়া পুঁতি। ভৈরবীর পথ চলা চলেইছে, অন্ধকার ঝরে তার এলোচুল উড়ছে, ~~[illegible]~~ কানে তার বিদ্যুতের দুল দুলছে। সমস্ত কল্পনাটা দশমহাবিদ্যার অন্যতম মূর্তি কালিকার সঙ্গে মেলে। আবার 'উন্মত্ত সে অভিসারে' কথাটি থেকে মনে আসে অভিসারিকার কল্পনাও।

এরপর কবি নদী তথা সৃষ্টিকে বলছেন: 'ওগো বৈরাগিনী'। বৈরাগী শব্দের অর্থ সংসদ বাংলা অভিধান দিচ্ছে: 'সংসারে অনাসক্ত, বিষয়বাসনামুক্ত।'[2] নদী তথা সৃষ্টিকে বৈরাগিনী বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন কবি? সমগ্র সৃষ্টি ~~বৈরাগিনি~~ বৈরাগিনীর মতো, উদাস বাউলের মতো রাগিনী বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছে। দুই একটা নক্ষত্র বা হাজার হাজার নক্ষত্রের মৃত্যু

গ]
হলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকে নির্বিকার। কোনো শোক বা মৃত্যু শোক তাকে স্পর্শ করে না। ~~এরর~~ এ কথা বোঝাতেই রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি তথা নদীকে বৈরাগিনী বলেছেন। – এরপর আমরা এই দ্বিতীয়স্তবকের শেষ দিকে দেখলাম নতুন সৃষ্টির ছবি। এলো জুঁই, চাঁপা বকুল পারুল' - এর অনুষঙ্গ। - এলো ঋতুচক্রের আবর্তন। ধ্বংসের ছবি ও সৃষ্টির ছবি এখানে একই চিত্রপটে আঁকছেন কবি। এইখানেই সৃষ্টি তথা নদীর সম্পূর্ণতা। কবির .. চোখে এখানে সৃষ্টি যেন নর্তকীর মতো চলছে, তার হাতে ঋতুর থালা, ঋতুতে ঋতুতে সেই থালা থেকে জুঁই, চাঁপা, বকুল, পারুল ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ফুলের ফোটা বা ঝরে পড়া পৃথিবীর ছবি। - সম্ভবতই কবি এখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। এরপরেই কবি বলছেন:

" শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও। "

- বোঝাই যাচ্ছে, উক্ত কথাগুলির মধ্যে সৃষ্টির তথা নদীর তিনটি রূপ: ভৈরবী, বৈরাগিনী এবং ঋতুচক্রের কল্পনা একসঙ্গে মিলে মিশে যাচ্ছে একাকার হয়ে।

কবিতার তৃতীয় স্তবকে দেখা যাচ্ছে:
বিশ্বের চঞ্চল চরণস্পর্শে ধূলি অমলিন হয়ে ওঠে, মৃত্যুর ধূলি পলকে প্রাণের আলোতে ঝলসে ওঠে। কবি বলছেন, মুহূর্তের জন্য গতি হারালে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু পর্বতের আকারে স্থির ~~হয়~~ হয়ে জমে যাবে, সমস্ত কিছুই যেন মূক, কবন্ধ (গলাকাটা দেহ), বধির ও অন্ধ হয়ে উঠবে। অর্থাৎ গতি

Scanned with CamScanner

এখানে জীবন তথা জীবনীশক্তির প্রতীক। গতির থেমে যাওয়া [অর্থাৎ] মানেই সবকিছুর থেমে যাওয়া। মৃত্যু। এরপর কবি বলছেন:

"অনুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে"

এখানে বিজ্ঞান ও পুরাণভাবনা - একই সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের (প্রকাশকাল: ১৯৩৭) 'পরমাণুলোক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন:

"অতিপরমাণুদের দুরন্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভকে সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে তাই বিশ্বে আছে শান্তি।"[৩]

উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন, হাঁ ধর্মী (পজিটিভ) ও না ধর্মী (নেগেটিভ) বিদ্যুতের বিপরীতের প্রতি আকর্ষণের কারণেই পরমাণুলোকে জন্ম নিয়েছে নিত্যগতি। এই আকর্ষণ একবার থেমে গেলে অনুর চেয়েও অনীয়ান্ পরমাণু সঞ্চয়ের অচল বিকারে স্তব্ধ হয়ে পড়বে। সেখানে সৃষ্টি নিজের ভারে নিজেকে আচ্ছন্ন করে প্রলয় ঘটাবে। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি প্রলয়ের মধ্যে লীন হয়ে যাবে। - পাশাপাশি, মহাদেবের অন্যতম অস্ত্র শূল। ত্রিশূল। - শূল শব্দটি এখানে মহাদেবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। - এই ভাবে বিজ্ঞান ও পুরাণ চেতনা পরস্পর মিলে মিশে যাচ্ছে।

কবিতার সবচেয়ে ছোট স্তবক হল চতুর্থ স্তবক। এখানে কবি সৃষ্টি তথা নদীকে নটী এবং অপ্সরা - দুটো চিত্রকল্প। কবি বলছেন: বিশ্বনর্তকী তার নৃত্যের মন্দাকিনীর মধ্যে দিয়ে মৃত্যুস্নানে বিশ্বকে শুচি তথা পবিত্র করে তুলছে। সোজা কথায়, মৃত্যু আছে বলেই পুরোনো জীর্ণ প্রতিনিয়ত

Scanned with CamScanner

[তিস্তা]

সঙ্কুচিত না হয়ে বিদায় নিচ্ছে। নতুনকে আসবার পথ করে দিচ্ছে। এখানে মৃত্যু নৈরাশ্যের দ্যোতক নয়। রবীন্দ্রদর্শনে মৃত্যু জীবনেরই অঙ্গ। জীবনেরই পরিপূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথের অনেকগান এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। যেমন অন্যতম একটি গান: 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু' কিংবা 'নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু তালে তালে' বা 'দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে।'

মন্দাকিনী ভাবনাটি এখানে কবির পৌরাণিক চেতনার পরিচায়ক। স্বর্গে গঙ্গা ... মন্দাকিনী, পৃথিবীতে ভাগীরথী বা জাহ্নবী আর পাতালে ভোগবতী - এমন কথা পুরাণে আছে।

কবিতার প্রথম স্তবকে সৃষ্টিকে তথা নদীকে ভুবনমোহিনী নর্তকীরূপে দেখলেন। এখানে শুধু দেখা নয়, কবি তাঁর নাড়ীতে নাড়ীতে চঞ্চল স্পন্দনধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন এবং অনুভবে তিনি হচ্ছেন রোমাঞ্চিত। কবি বলছেন: 'রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা।' - দুটো ছবি এখানে একই সঙ্গে দেখছেন কবি। সৃষ্টির আদিলগ্নে সমুদ্রময় পৃথিবী। - এর পাশে, জল ও স্থলে বিভক্ত পৃথিবীর প্রাকৃতিক রূপ। - এই দেখাটা আরও স্পষ্ট হচ্ছে, যখন কবি বলছেন:

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

পৃথিবীর আদিরূপ থেকে প্রাণের সৃষ্টির ছবি কবি আঁকছেন

Scanned with CamScan

কবিতার শেষ স্তবকে কবি সৃষ্টির ঢেউয়ে ঢেউয়ে [কুড়ি] দেখছেন 'তরণী কাঁপিছে থরথর'। সৃষ্টির স্রোত যাকে শাহজাহান কবিতায় কবি বলছেন কালস্রোত, সেই স্রোতে তরণীর মতনই ভাসমান কবির জীবন। কবি উপলব্ধি করছেন নদীর মতন তার জীবনও এগিয়ে চলবে সাগরের দিকে। নদী যেমন মহাসাগরে মিশে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে চলার একটা পূর্ণতা খুঁজে পায়, ঠিক তেমন নৌকার মতন ভাসমান কবির জীবনও একদিন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যাবে 'পশ্চাতের কোলাহল হতে / অতল আঁধারে অকূল আলোতে।'

বোঝাই যায়, আলো এখানে নৈরাশ্য মৃত্যুর দ্যোতক নয় জীবনের তথা জীবনের পূর্ণতার পরিচায়ক।

তথ্যসূচি

১. সংসদ বাংলা অভিধান: শৈলেন্দ্র বিশ্বাস দ্বারা সংকলিত: সাহিত্য সংসদ: প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৫৭, অষ্টাদশ মুদ্রণ: এপ্রিল, ২০১০: পৃষ্ঠা: ৬৭১।

২. তদেব, পৃষ্ঠা: ৬৪৫।

৩. বিশ্বপরিচয়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: প্রকাশ: ১৯৩৭। রবীন্দ্র রচনাবলী: অষ্টাদশ খণ্ড: পশ্চিমবঙ্গ সরকার: প্রকাশ: শ্রাবণ, ১৪০১, আগস্ট ১৯৯৪। পৃষ্ঠা: ২১৪।

– ভীষ্মদেব মুখোপাধ্যায়। ১-২ এপ্রিল, ২০২০

Scanned with CamScanner